ইসমাইল রেহান

আফগানিস্তানের ইতিহাস

১-৩ খণ্ড

আফগানিস্তানের ইতিহাস

১-৩ খণ্ড

মূল : **ইসমাইল রেহান**

অনুবাদক

আবদুর রশীদ তারাপাশী

যুবাঈর আহমাদ

কালান্তর প্রকাশনী

প্রকাশকাল : মে ২০২২

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ১৮০০, US $ 75. UK £ 60

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক

কালান্তর প্রকাশনী

বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার

সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র

ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা

বাংলাবাজার, ঢাকা।

০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

অনলাইন পরিবেশক

রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া

bokharasyl@gmail.com

Afganistaner Etihas

by **Ismail Rehan**

Published by

Kalantor Prokashoni

+88 01711 984821

kalantorprokashoni10@gmail.com

facebook.com/kalantorprokashoni

www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

অর্পণ

ওই সকল শহিদের রুহের মাগফিরাত কামনায়, যাঁদের কলিজার তাজা রক্ত ইসলামের সবুজ বাগানে আজও সঞ্জীবনী শক্তি দিয়ে যাচ্ছে! রাহিমাহুমুল্লাহ!

—লেখক।

যাঁদের পাহাড়সম ইখলাস, সাগরপ্রমাণ ধৈর্য আর অবর্ণনীয় আত্মত্যাগে পরিচালিত আন্দোলন দীর্ঘ প্রায় দুই শতাব্দী পর পৃথিবীর বুকে আসমানি আদালতের ফলাফল হয়ে আবির্ভূত হয়েছে।
...আহমাদ ইবনু ইরফান শহিদ ও তাঁর পুণ্যাত্মা সঙ্গীদের আত্মার মাগফিরাত কামনায়।

—যুবাঈর আহমাদ।

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, ইসলামের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে থাকা আফগানজাতির ইতিহাস আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরেছি। বইটির গুরুত্ব নিয়ে আলাদা করে কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করছি না। বইটির রচয়িতা সময়ের তুমুল আলোচিত পাকিস্তানের ইতিহাস-গবেষক মাওলানা ইসমাইল রেহান। বইটি তাঁর দীর্ঘদিনের গবেষণা আর শ্রমের ফসল। তিনি সময়ের ধারাবাহিকতায় ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায় এত পরিমিত শব্দ ও বাক্যে তুলে ধরেছেন যে, এখান থেকে একটি শব্দ বা বাক্য বাদ দিলে ছন্দপতন ঘটবে। তাই আমরাও দীর্ঘ সময় নিয়ে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে কাজটি সমাপ্ত করে আপনাদের হাতে তুলে দিলাম।

প্রথম খণ্ড অনুবাদ করেছেন যুবাঈর আহমাদ। দ্বিতীয় খণ্ড যৌথভাবে অনুবাদ করেছেন কথাসাহিত্যিক আবদুর রশীদ তারাপাশী ও যুবাঈর আহমাদ। এই খণ্ডের ১৬-১৮ এবং ২০, ২২ ও ২৩ নম্বর অধ্যায় করেছেন যুবাঈর আহমাদ। বাকি অধ্যায়গুলো করেছেন আবদুর রশীদ তারাপাশী। তৃতীয় খণ্ড অনুবাদ করেছেন আবদুর রশীদ তারাপাশী। আলহামদুলিল্লাহ, অত্যন্ত চমৎকার অনুবাদ তাঁরা আমাদের উপহার দিয়েছেন। আল্লাহ তাঁদের উত্তম বদলা দান করুন।

বইটির ভাষা ও প্রুফ সমন্বয়ের কাজ করেছেন ইলিয়াস মশহুদ ও মুতিউল মুরসালিন। তাদের সহযোগিতা করেছেন আলী আহমদ ও আবদুল্লাহ আরাফাত। আমি নিজে আদ্যোপান্ত পড়েছি। পাঠের সুবিধার্থে অনুবাদক ও আমাদের পক্ষ থেকে কিছু টীকা সংযোজন করা হয়েছে।

যাবতীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টার পরও কাজে ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। কারও কাছে কিছু দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের জানাবেন। ইনশাআল্লাহ সংশোধন করা হবে।

আবুল কালাম আজাদ
প্রকাশক
২৭ জানুয়ারি ২০২২

অনুবাদকের দুটি কথা

বিজয়ীদের বিজয়গাথা পড়তে ও শুনতে একধরনের অপার্থিব আনন্দ পাওয়া যায়। বিজয় মানবজনমের অন্যতম সফল মুহূর্ত হিসেবে বিবেচিত। বিজয় মানুষকে দেয় প্রাপ্তির আনন্দ, এনে দেয় সৃষ্টিসুখের অনুভব। ভাঙা-গড়ার আনন্দে উদ্‌বেলিত হয় সমগ্র সত্তা। এই বিজয় যদি হয় চারটি দশক ধরে চলা ধারাবাহিক যুদ্ধ, অসম সাহসের অতুলনীয় প্রদর্শন আর অবর্ণনীয় আত্মত্যাগের ফসল, যদি এর সঙ্গে যুক্ত হয় ইসলাম ও বিশ্বমুসলিমের প্রতিরক্ষার প্রশ্ন; তখন এই ইতিহাস অধ্যয়ন ইসলামপ্রেমী পাঠকসত্তাকে যে সুখানুভূতি দেবে, তা আর খুলে বলতে হবে না।

একটি জাতি। একটি ইতিহাস। এই ইতিহাস গৌরবের। এই ইতিহাস বিজয়ের। এই ইতিহাস প্রতিরোধের। এই ইতিহাস আদর্শের তরে আত্মত্যাগের। হিন্দুকুশ ও হিমালয়ের চারদিকে ছড়িয়ে থাকা ঐতিহাসিক এই ভূমিকে আল্লাহ যেন ইসলামের অজেয় দুর্গ হিসেবেই তৈরি করেছেন। হাজার বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে একের পর এক পরাশক্তির আগ্রাসন রুখে দিয়েছে বীর আফগানজাতি। আল্লামা ইকবাল ঠিকই বলেছেন,

افغانیوں کی غیرتِ دیں کا ہے یہ علاج

مُلّا کو اُن کے کوہ و دمن سے نکال دو

বীর, আত্মমর্যাদাশীল আফগানদের যদি পরাজিত করতে চাও,
তাহলে হিন্দুকুশের কোল থেকে মোল্লাদের বিদায় করো!

কিন্তু এই ভূমিতে ইসলাম কীভাবে প্রবেশ করল? কীভাবে দুর্ধর্ষ, যুদ্ধবাজ ও আত্মমর্যাদাশীল এই জাতির অন্তরে ইসলাম জায়গা করে নিল? মূলত সাহাবিদের হাত ধরেই এই অঞ্চলে ইসলাম প্রবেশ করেছে। দ্বিতীয় খলিফা উমর রা. তো অভিযানের শুরুতেই এই অঞ্চল ও এতদঞ্চলের জাতিগুলোর ইতিহাস গভীরভাবে নিরীক্ষণ করেছেন। এদের ডিঙিয়ে সিন্ধুতে প্রবেশ না করার সিদ্ধান্ত তখনই চূড়ান্ত হয়েছিল। এরপর দুর্ধর্ষ এই জাতির অন্তরে ইসলাম প্রবিষ্ট করাতে বেছে নেওয়া হয় দাওয়াতের পথ। অসংখ্য বুজুর্গ ও সুফি তাঁদের নাম-পরিচয় ইতিহাসের পাতায় না লিখিয়ে ধারাবাহিক দুই দশক ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। পরবর্তীকালে দীনি দাওয়াতের

এই ফল সেথা প্রকাশ পায়। ইলম, ইহসান, দাওয়াত ও জিহাদের পথে ইতিহাসের সেরা সন্তানদের জন্ম দেয় বরকতময় এই ভূমি। সাফফারি আন্দোলন, হিন্দুস্থানের মুসলিম বিজেতাগণ, আহমাদ শাহ দুররানি, সাইয়িদ আহমাদ শহিদের জিহাদি আন্দোলন থেকে নিয়ে আজকের তালেবান আন্দোলন; সাহাবিদের সেই দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গিরই জ্বলন্ত প্রমাণ বহন করছে। ইবরাহিম ইবনু আদহাম, শাকিক বলখি, আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক, ইমাম আজম আবু হানিফা, ইমাম আবু দাউদ সিজিস্তানি, সুলতান মাহমুদ গজনবি, হাজি মির ওয়াইস খান, আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর, জালালুদ্দিন হাক্কানি রাহ. এ মাটিরই কৃতিসন্তান।

ইসলাম মানবজনমের একমাত্র সফল ও গ্রহণীয় জীবনদর্শন। ইসলাম ছাড়া কোনো জাতির গৌরব চিরস্থায়ী হওয়া সম্ভব নয়। উমর রা. এ দর্শনটি আরব ও অন্যান্য জাতির কর্ণধারদের বার বার বোঝাতে চেয়েছিলেন। তিনি বলতেন,

نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله

আমরা এমন জাতি, আল্লাহ যাদের ইসলামের জন্য সম্মানিত করেছেন।
আমরা ইসলামপ্রশ্নে শৈথিল্য দেখালে অচিরেই লাঞ্ছনার মুখ দেখব।

জাতি হিসেবে আফগানরা এই মন্ত্র খুব ভালোভাবে রপ্ত করেছে। হাজার বছরের ইতিহাসে ইসলামপ্রশ্নে তারা নিজেদের অস্তিত্বকে বার বার হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে। তারা জানত, এটাই শেষ নয়। খুব দ্রুতই জেগে ওঠার সুযোগ তৈরি হবে। হয়েছেও তা-ই। চেঙ্গিস খান ও তৈমুরের বর্বরতার সামনে তারা দুইবার বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। নিজেদের অসীম আত্মত্যাগের মাধ্যমে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোও রক্ষার চেষ্টা করে তারা। বিনিময়ে আল্লাহ তাদের দিয়েছেন সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা ও স্বীকৃতি।

কালপরিক্রমায় মুসলিমবিশ্বের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সুযোগে বিশ্বজুড়ে ইউরোপীয় উপনিবেশ শুরু হয়। দেখতে দেখতে একসময় সুদূর পশ্চিম থেকে দূরপ্রাচ্য পর্যন্ত ইউরোপীয়দের অভিশপ্ত থাবা বিস্তৃত হয়ে পড়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে মধ্য-এশিয়া ও উপমহাদেশে সমকালীন দুই পরাশক্তি রুশ ও ব্রিটিশদের মধ্যে কার্যত বাফার জোনে পরিণত হয় আফগানিস্তান। চলতে থাকে গ্রেট গেম। রুশি জারদের ‘গরম পানি’ পর্যন্ত পৌঁছানোর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতা শতাব্দী পেরিয়ে গেলেও কমিউনিস্ট সোভিয়েত রাশিয়াকে শেষতক এই ভূমিতে প্রবেশে বাধ্য করেছিল; কিন্তু ইমানি চেতনায় বলীয়ান আফগান জনতা দুই পরাশক্তির কারও কাছেই মাথা নত করেনি। বেছে নেয় তারা অসম প্রতিরোধযুদ্ধ। ধারাবাহিক তিনবার অ্যাংলো-আফগান যুদ্ধ হয় ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে এসে। বিশ্বের একক পরাশক্তি হওয়ার পরও ব্রিটিশরা আফগান ভূমিতে স্থায়ী হতে ব্যর্থ হয়েছে। পরবর্তী সময়ে একই শতাব্দীতে

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সেই ধারাবাহিকতায় একবিংশ শতাব্দীতে এসে মোড়ল সেজে বসা আমেরিকাও তাদের সর্বশক্তি খুইয়েছে সাম্রাজ্যবাদের এই কবরস্থানে। এমনকি শেষপর্যন্ত পালাবার পথও খুঁজে পায়নি তারা। সত্যিকারার্থে এই ভূমি যেন Graveyards of the Empires।

সমকালীন পরিস্থিতি নিয়ে বেশি কিছু বলার নেই। সমগ্র বিশ্বের সামনে এখন এই ভূমির সার্বিক পরিস্থিতি খোলা জানালার মতো দৃশ্যমান! আমি শুধু এই ভূমির বিশাল ছাতির অধিকারী বীর-বাহাদুর জাতির হৃদয়ের বিশালতার একটি উদাহরণ টানব। যুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে যাদের জানাশোনা আছে তারা জানেন, যুদ্ধাপরাধ একটি প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক অপরাধ। যুদ্ধ সমাপ্তির পর বিজয়ীরা সাধারণত পরাজিত স্বজাতিদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে না। ইতিহাসে এমন উদারনৈতিক আচরণের দৃষ্টান্ত বিরল। মাত্র দুটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আমরা এ ক্ষেত্রে দেখতে পাই : এক. মক্কা বিজয়। দুই. জেরুসালেমের দ্বিতীয় বিজয়। প্রথমটি ঘটেছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত ধরে। মানবজাতির ব্যাপারে তাঁর মহানুভবতার বয়ান এখানে নিষ্প্রয়োজন। দ্বিতীয় ঘটনাটি মহাবীর সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির। লক্ষাধিক মুসলিম-হত্যাকারী ক্রুসেডারদের তিনি বিনা শর্তে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

৮৩৪ বছর পর পৃথিবী আবারও এমন একটি অনন্য পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করল। ইসলামের সুমহান শিক্ষার প্রভাব আফগানদের সুবিশাল হৃদয়ে না থাকলে এমন সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা তাদের পক্ষে কি আদৌ সম্ভব হতো? এই সময়ে আবারও প্রমণিত হলো, দ্বিতীয় খলিফা আফগানে সেনা-অভিযানের অগ্রযাত্রা মুলতুবি করে সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন। আজ তারাই ইসলামের ধারক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

কাজের ব্যাপারে কিছু কথা বলি। দোহা চুক্তির কয়েক মাস পর কাজটি হাতে আসে। তবে সত্যি বলতে যথাযথ কো-অর্ডিনেশনের অভাব ছিল কিছুটা। ফলে কাজে বরকত অনুভব করতে পেরেছি স্বাভাবিকের চেয়ে কিছু কম পরিমাণে। আমার দিক থেকে কাজ হচ্ছিল খুবই থেমে থেমে। কখনো ভাবতাম, নাহ! আপাতত এই কাজ প্রকাশিত হবে না। 'তারা' ক্ষমতায় না এলে এ গ্রন্থটি হয়তো তেমন সাড়া পাবে না। এই ধারণা থেকে কচ্ছপগতিতে কাজ এগিয়েছে। পাঠকদের বোঝার সুবিধার্থে কিছু কিছু জায়গায় টীকা-টিপ্পনী যোগ করেছি। কিছু কিছু জায়গায় তথ্যগত ত্রুটি মনে হওয়ায় সেগুলোও তুলে ধরা হয়েছে। ঘটনার প্রাসঙ্গিকতা আরও প্রাঞ্জল করতে কিছু জায়গায় তথ্যগত সংযোজনও করা হয়েছে। নোট পাঠানো হয়েছে লেখক সমীপেও। পরবর্তী সংস্করণে নোট যাচাইপূর্বক মূল উর্দুতে সেসব সংশোধন করা হবে মর্মে জানিয়েছেন তিনি। অনুবাদ শেষে পরিমার্জনা (রিভিশন) পর্যায় চলছিল, একদিন হঠাৎ লক্ষ করি, মুজাহিদদের হাতে আফগানিস্তানের প্রাদেশিক রাজধানীগুলোর পতন শুরু হয়েছে।

ভাবলাম কয়েক মাস তো লাগবেই। যদিও দুই দশকের যুদ্ধকালে *বুখারি শরিফের* চার খণ্ডের ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনাকারী এক মোল্লা সাহেব (শায়খ মোল্লা শাহাবুদ্দিন দিলাওয়ার হাফিজাহুল্লাহ) মস্কোয় সংবাদ সম্মেলনে বললেন, 'চাইলে দুই সপ্তাহেই কেল্লা ফতেহ করতে পারি, বি-ইজনিল্লাহ!' কেন যেন মনে হয়েছিল হলে হতেও পারে। এরপরই শুরু হলো ধারাবাহিক ফল। দ্য গ্রেট কনজিকিউটিভ ফল অব দি প্রভিন্সিয়াল ক্যাপিটালস! হেরাত থেকে নাঙ্গারহার, বলখ থেকে কান্দাহার—মাত্র নয় দিন। অবিশ্বাস্য! অকল্পনীয়! অভূতপূর্ব! অভাবনীয়!

বিশ্বাস করুন পাঠক, সেই নয়টি দিনে একপ্যারা কাজও এগোতে পারিনি। খালি চেয়ে চেয়ে দেখে গিয়েছি। যাইহোক, পরে প্রকাশক মহোদয়ের জোর তাগাদায় কাজটি তার টেবিলে পাঠাতে সক্ষম হই। আসলে দীর্ঘদিন আগে প্রকল্প শুরু হলেও এ সময়টিই হয়তো আমার অলসতাসহ নির্ধারিত ছিল। ইজান, আলহামদুদিল্লাহ!

কথা বেশি বলে দায় বাড়াতে চাই না। বিজয়ী ইমানদীপ্ত জাতির ইতিহাস এখন আপনাদের সামনে। পড়ুন, উপভোগ করুন। আগামীর পথচলার পাথেয় গ্রহণ করুন। দুআয় তাদের স্মরণে রাখুন। আর হ্যাঁ! অসংগতি, তথ্যবিভ্রাট অথবা কোনো পরামর্শ থাকলে অবশ্যই জানিয়ে বাধিত করবেন। গ্রন্থটির লেখক, মূল প্রকাশনী, উম্মাহদরদি প্রকাশক জনাব আবুল কালাম আজাদ এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে আল্লাহ তাআলা নেক হায়াত, উত্তম জীবন এবং কাঙ্ক্ষিত সেই 'মৃত্যু' নসিব করেন। আমিন।

যুবাঈর আহমাদ
zamnoor622@gmail.com

প্রথম খণ্ড

সূচিপত্র

লেখকের কিছু কথা ১৫

১ম অধ্যায়
ইসলামপূর্ব যুগে আফগানিস্তান ১৯

২য় অধ্যায়
আফগানিস্তানে ইসলামের আলো ৩২

৩য় অধ্যায়
আব্বাসি খিলাফতকালে আফগানিস্তান ৫৯

৪র্থ অধ্যায়
গজনবি শাসনামল ৭৯

৫ম অধ্যায়
ঘুরি শাসনামল ১৩৪

৬ষ্ঠ অধ্যায়
খাওয়ারিজমি সালতানাত ও তাতার আগ্রাসন ১৪৯

৭ম অধ্যায়
কুরত রাজবংশের শাসনামলে আফগানিস্তান ১৭৪

৮ম অধ্যায়
তৈমুরি শাসকগোষ্ঠী ১৮৬

৯ম অধ্যায়
উজবেক, ইরানি ও মোগল শাসকবৃন্দ ২০২

১০ম অধ্যায়
স্বায়ত্তশাসনের জন্য আন্দোলন ২১৭

১১ তম অধ্যায়
ইরানি শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধিকার আন্দোলন, স্বাধীন হোতকি সালতানাতের উত্থান ২৩৭

১২ তম অধ্যায়
নাদির শাহ থেকে আহমাদ শাহ আবদালির যুগ ২৬০

১৩ তম অধ্যায়
আবদালির উত্তরসূরি এবং ইংরেজদের ষড়যন্ত্র ৩২৩

১৪ তম অধ্যায়
স্বায়ত্তশাসন, শিখদের গোলামি এবং সাইয়িদ আহমাদ শহিদের জিহাদি আন্দোলন ৩৪৫

১৫ তম অধ্যায়
আজ্ঞাবহ শাসকদের যুগ ৩৮১

দ্বিতীয় খণ্ড

সূচিপত্র

১৬ তম অধ্যায়

ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদি আন্দোলন ৭

১৭ তম অধ্যায়

দোস্ত মুহাম্মাদ খান, শের আলি খান ও ইয়াকুব আলি খান ৪৩

১৮ তম অধ্যায়

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ৭৪

১৯ তম অধ্যায়

আমির আবদুর রাহমান খানের যুগ ১০৯

২০ তম অধ্যায়

হাবিবুল্লাহ খানের যুগে আফগানিস্তান ১৩১

২১ তম অধ্যায়

বারেকজাই পরিবারের শেষ শাসক ১৭৫

২২ তম অধ্যায়

বাচ্চা সাকা, নাদির খান এবং শেষ বাদশাহ জহির শাহ ২১৩

২৩ তম অধ্যায়

কমিউনিজমের ছায়া, গণতন্ত্র এবং সাওর বিপ্লব ২৩১

২৪ তম অধ্যায়

আফগান ভূমিতে সোভিয়েত আগ্রাসন ২৫৩

২৫ তম অধ্যায়
আফগান জিহাদের বিখ্যাত ব্যক্তি ও সংগঠনসমূহ **২৮১**

২৬ তম অধ্যায়
আগুন, ইবরাহিমের সন্তান ও নমরুদ **২৯৭**

২৭ তম অধ্যায়
চূড়ান্ত যুদ্ধের কাল **৩২৫**

২৮ তম অধ্যায়
লাল ভল্লুকের পরাজয় : নাজিবুল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ **৩৫৯**

২৯ তম অধ্যায়
কাবুল বিজয় : মুজাহিদদের সরকার এবং গৃহযুদ্ধ **৩৮০**

তৃতীয় খণ্ড

সূচিপত্র

৩০ তম অধ্যায়

তালেবানের অভ্যুদয় ০৭

৩১ তম অধ্যায়

আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর ৩৪

৩২ তম অধ্যায়

কাবুল বিজয় এবং মাজার-ই-শরিফের মর্মন্তুদ ঘটনা ৬০

৩৩ তম অধ্যায়

মাজার-ই-শরিফ ও বামিয়ান বিজয় ৯৫

৩৪ তম অধ্যায়

তালেবানবিরোধী আন্তর্জাতিক চক্রান্ত ১১৭

৩৫ তম অধ্যায়

১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকার আফগান অভিযান ১৪৮

৩৬ তম অধ্যায়

আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী থাবায় আফগানিস্তান ১৯৪

৩৭ তম অধ্যায়

আমেরিকার মুখোমুখি তালেবান ২১১

৩৮ তম অধ্যায়

বাঁচা-মরার লড়াই : ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দের বিবরণী ২৩১

৩৯ তম অধ্যায়

বুশের শেষ রাউন্ড : ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দের বিবরণী **২৫২**

৪০ তম অধ্যায়

ওবামা ও আফগানিস্তান : ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দের বিবরণী **২৮০**

৪১ তম অধ্যায়

শান্তি আলোচনা এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ **৩১২**

৪২ তম অধ্যায়

২০১১ খ্রিষ্টাব্দ **৩৩৯**

৪৩ তম অধ্যায়

আফগানিস্তানের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ **৩৫৫**

৪৪ তম অধ্যায়

আফগানজাতি কি বনি ইসরাইলের বংশধর **৩৬৩**

অতীত ও বর্তমান শতাব্দীর আফগান শাসকদের তালিকা **৩৮২**

লেখকের কিছু কথা

ইতিহাস একটি জাতির দর্পণ। ইতিহাস সংরক্ষণের গুরুভার সেই জাতির বোদ্ধামহলের কাঁধে অর্পিত থাকে। ইতিহাসের মাধ্যমেই একটি জাতির পরিচয় নির্ণীত হয়। নিকট-ইতিহাসে প্রাচ্যবিদরা অ্যাকাডেমিক ধাঁচ অবলম্বন করে উম্মাহর ইতিহাস কলঙ্কিত করার সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়ে গেছে। আমাদের চলমান সময় নিয়েও আমরা অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন। নিকট-অতীতের ইতিহাসের পাশাপাশি বর্তমান আবহের ইতিহাসকেও যদি আমরা পূর্ণ সততা ও সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গো বিশুদ্ধ দলিল-প্রমাণ ও সর্বাধিক তথ্যের আলোকে সংরক্ষণ করতে না পারি, তাহলে আগামী প্রজন্মের হাতে ইতিহাস বলতে শুধু প্রাচ্যবিদদের বিষমাখা কলমের কালি পৌঁছাবে; এ কথা খুলে বলতে হয় না।

বিশেষ করে আফগানিস্তানের ইতিহাস প্রাচ্যবিদদের বিষাক্ত লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। পশ্চিমাবিশ্ব তাদের দাজ্জালি মিডিয়ার মাধ্যমে আফগানিস্তানের তাওহিদি মুসলমানদের সন্ত্রাসী প্রমাণে উঠেপড়ে লেগে আছে। আগামী দিন যখন এসব তথ্য-প্রমাণ নিয়ে কোনো ইতিহাস গবেষক আফগানিস্তানের ইতিহাস রচনা করবেন, তখন সেখান থেকে উঠে আসা দুর্গন্ধযুক্ত পুথিমালা মুসলিম যুবকদের মন-মগজ আফগানদের ব্যাপারে বিদ্বেষী করে তুলবে, এটাই স্বাভাবিক।

এই উদ্‌বেগ ও উৎকণ্ঠা থেকেই ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে আমি প্রতি রবিবারে *জরবে মুমিন* পত্রিকায় আফগানিস্তানের ইতিহাস নিয়ে লিখতে শুরু করি। শুরুতে উদ্দেশ্য ছিল, আফগানিস্তানের বিগত দুই দশক নিয়েই শুধু লিখব, যেখানে মৌলিকভাবে স্থান পাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গো আফগান মুজাহিদদের ১০ বছরব্যাপী চলা অসম যুদ্ধের বর্ণনা এবং তালেবানদের উত্থান ও তৎপরবর্তী সময়ের বিস্তারিত আলোচনা; কিন্তু কয়েকটি কলাম লেখার পর আমার মনে হলো, আফগান ইতিহাসের প্রত্যেকটি যুগ ও অধ্যায় একটি অপরটির সঙ্গো ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। বিচ্ছিন্নভাবে দুয়েকটি দশকের ইতিহাস লিখে আফগানজাতিকে উপস্থাপন করা ঠিক হবে না। যদিও অন্যান্য জাতির সামসময়িক ইতিহাসও তাদের সুদূর অতীতের সঙ্গো যুক্ত থাকে; কিন্তু আফগানজাতি ও আফগানিস্তানের ইতিহাস বিগত ১ হাজার বছর ধরে প্রতিটি যুগকে

এত নিবিড়ভাবে যুক্ত করেছে যে, পৃথকভাবে আপনি কোনো একটি যুগকে উপস্থাপন করতে পারবেন না। এ জন্য আল্লাহর ওপর ভরসা করে সিদ্ধান্ত নিই, ধীরে ধীরে হলেও আফগানিস্তানের প্রাপ্ত সব ইতিহাস থেকে বিশুদ্ধ বর্ণনাগুলো একত্রিত করে আফগানজাতির সম্পূর্ণ ইতিহাস তুলে ধরার সর্বোচ্চ প্রয়াস চালাব, ইনশাআল্লাহ।

এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে নতুনভাবে আবার যখন লিখতে শুরু করি, তখন লক্ষ করি, কিছুদিনের মধ্যেই পাঠকমহলে ব্যাপক সাড়া তৈরি হয়েছে। পাঠকদের পক্ষ থেকে অসংখ্য চিঠি আসতে থাকে, বিশেষ করে যুবকদের কাছ থেকে। এ অঞ্চলের ইসলামের ইতিহাস জানার ব্যাপারে যুবশ্রেণির এমন উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে আমার মনোবল শতগুণ বেড়ে যায়। পৃথিবীর তাবৎ প্রচারমাধ্যম ব্যবহার করে যখন ইসলাম ও মুসলিমদের অতীত কলঙ্কিত করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে, তখন বিশুদ্ধ ইতিহাসকে ছোট্ট একটি পত্রিকার মাধ্যমে জানার ব্যাপারে সেই জাতির যুবকদের এই বিপুল আগ্রহ সবাইকে ভাবতে বাধ্য করে যে, ইসলাম এতদঞ্চলের সমাজ-জীবনের কতটা গভীরে প্রোথিত।

আফগানজাতির ইসলামি ইতিহাসের ওপর লেখালেখি চালিয়ে যাওয়ার অনুরোধের পাশাপাশি আরেকটি অনুরোধ পাঠকমহল থেকে বার বার আসতে থাকে। চলমান কাজটি কলাম আকারে শেষ হলে যেন একে দু-মলাটের মধ্যে নিয়ে আসা হয়।

আমার এই কাজে শ্রদ্ধেয় পাঠকদের এমন উচ্ছ্বাস দেখে আমি নিয়ত করি, যতটা পারা যায় গভীরে গিয়ে আফগান অঞ্চলের ইসলামি ইতিহাসকে তুলে নিয়ে আসব। কিন্তু ভাবলে কী হবে, কাজটি মোটেও সহজ ছিল না। কত পুরানো পাণ্ডুলিপি ও সুপ্রাচীন ইতিহাসগ্রন্থ আমাকে একটি তথ্যের জন্য ঘাঁটতে হয়েছে, তা শুধু আমিই জানি। কিন্তু আপন ভাইদের ওপর বয়ে চলা জুলুম ও তাদের পক্ষ থেকে জুলুম প্রতিরোধের অদম্য মনোবল আমাকে এই অঞ্চলের ইতিহাস অধ্যয়নে সবসময় উৎসাহ জোগাত। আমার হাতে সময় ছিল খুবই কম। জামিয়াতুর রশিদের শরিয়া ফ্যাকাল্টির অধীনে আমাকে ইসলামের ইতিহাস-বিভাগে নিয়মিত ক্লাস নিতে হতো। পাশাপাশি ছোটদের জন্য ইসলাম বিষয়ে কাজও অব্যাহত ছিল। এর পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক ও দাপ্তরিক আনুষঙ্গিক আরও কিছু কাজে আমাকে সময় দিতে হতো। ফলে প্রতিদিন *তারিখে আফগানের* ওপর কাজের সময় ও সুযোগ ছিল না। সে জন্য প্রতি শুক্রবারকে এ কাজের জন্য আলাদা করে রাখি। প্রতি জুমুআর দিন ফজরের পর থেকে কাজ শুরু করতাম। কখনো কখনো জুমুআর আজান পর্যন্ত আবার কখনো আসরের নামাজ পর্যন্ত একাধারে কাজ করে যেতাম। কোনো কোনো বিষয়ে তথ্য ও প্রমাণ যাচাই করতে এত বিস্তৃত অধ্যয়ন করতে হতো যে, ফজর থেকে আসর পর্যন্ত কখনো কখনো কলমের কালি মাত্র কয়েকটি পৃষ্ঠাকে কালো করতে পারত!

কাজটি করতে গিয়ে সেসব বিষয়ও সামনে চলে আসে, যা একজন গবেষকের ধৈর্য ও উদ্দীপনার পরীক্ষা নেয়। যেমন : বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে পাঠাগারে দিনভর বসে থাকা, প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলোর দুর্বোধ্য তথ্য চশমার মোটা কাচের মধ্য দিয়ে পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করা, সামসময়িক ইতিহাসের খুঁটিনাটি জানতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। কিন্তু আমার হাতে একজন পুরোদস্তুর গবেষকের মতো পর্যাপ্ত সময় ছিল না। সারা সপ্তাহ তথ্যসংগ্রহ করে আমাকে শুক্রবারে সেই তথ্যগুলো সংকলন করতে হতো। (কারণ, সে সময়ে প্রতিসপ্তাহে *জরবে মুমিনে* লেখা জমা দেওয়া লাগত)। তাই আমার সংকলিত তথ্য-প্রমাণের উপস্থাপনার ওপর আমি পূর্ণ পেশাদারিত্ব দাবি করছি না।

তারপরও এতটুকু বলা যায়, ইসলামি ইতিহাসের ওপর গবেষণামূলক এবং পাঠকের চাহিদা, উপলব্ধির যোগ্যতা ও অভিরুচির ওপর লক্ষ রেখে সাজানো এ গ্রন্থ ইসলামি ইতিহাসের ভান্ডারে একটি অনবদ্য কাজ হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের সঙ্গে সেই সময়ের ইতিহাস থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা সামনে রেখে বর্তমান ও আগামী দিনের পথচলার শিক্ষা গ্রহণের চেষ্টা করা হয়েছে। এ জন্য এই গ্রন্থে অধিক পরিমাণে তথ্যসূত্র উল্লেখের বিষয়টি উপস্থাপিত হয়নি। যেমনটি পত্রপত্রিকার কলামে লেখা হয়ে থাকে, ঠিক সেভাবেই গ্রন্থটি সাজানো হয়েছে। পাঠকদের বার বার অনুরোধের নিমিত্তে যেহেতু সব কলাম একত্রিত করে একটি গ্রন্থের রূপ দেওয়া হচ্ছে, তাই প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে তথ্যসূত্র হিসেবে গ্রন্থগুলোর শুধু নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আশা করি, পাঠক এই পদ্ধতিতে গ্রন্থটি দেখে খুশি হবেন।

ইতিহাস বিষয়ে বিশেষত আফগান অঞ্চলের ইসলামি ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ ও গবেষকমণ্ডলীর কাছে আমি আশা করব, আলোচ্য গ্রন্থে তথ্যসূত্র অথবা উপস্থাপনার আঙ্গিকের ব্যাপারে যদি কোনো ত্রুটি বা অসংগতি তাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে মেহেরবানি করে অধমকে অবগত করলে পরবর্তী সংস্করণ ছাপার আগেই সেগুলো শুধরে নেওয়া হবে। আরবিসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক ভাষাতেও গ্রন্থটি অনূদিত হওয়া প্রয়োজন, এটিও অধম গভীরভাবে উপলব্ধি করেছে। আল্লাহ তাওফিক দিলে খুব দ্রুতই অন্যান্য ভাষায়ও গ্রন্থটি অনুবাদের প্রকল্প শুরু হবে ইনশাআল্লাহ।

ওয়াসসালাম

মুহাম্মাদ ইসমাইল রেহান (করাচি)
rehanbhai@gmail.com

১ম অধ্যায়

ইসলামপূর্ব যুগে আফগানিস্তান

اناس اذا لاقوا عدا فكانما
سلاح الذي لاقوا غبار السلاهب

এরা এমন মানুষ ছিলেন, শত্রুর সঙ্গে যখন তাদের লড়াই হতো, তখন প্রতিপক্ষের অস্ত্রগুলো তাদের দৃষ্টিতে ঘোড়ার খুরের নিচে থাকা ধূলিকণার মতো তুচ্ছ মনে হতো।

মধ্য-এশিয়া, উপমহাদেশ ও চীনের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত আফগানিস্তান। পাহাড়-পর্বতঘেরা এ দেশটি সিংহহৃদয় মানুষদের দেশ হিসেবে পরিচিত। বহু শতাব্দী ধরে এই অঞ্চল উম্মাহকে এমন ইমানদীপ্ত, উচ্চ মনোবল, অসামান্য সাহস ও শক্তিমান পুরুষদের জোগান দিয়ে এসেছে যে, কবির আলোচ্য চরণদুটি তাদের ক্ষেত্রে পুরোপুরি মিলে যায়। প্রতিটি যুগে মাজলুম উম্মতে মুসলিমাকে শত্রুর সামরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন থেকে রক্ষায় এই অঞ্চল অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর মতো ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়ার আমলকে আফগানিস্তানের তাওহিদি জনতা সবসময় প্রাণাধিক গুরুত্বের সঙ্গে আদায় করে এসেছে।

আফগানিস্তান : সিংহহৃদয় মুসলিমদের আবাসভূমি

আফগান মুসলমানদের দীনি আত্মমর্যাদাবোধ ও জিহাদি উদ্দীপনা সম্পর্কে বিখ্যাত আরব ইতিহাসবিদ আমির শাকিব আরসালান দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছেন,

> কাবার রবের শপথ, যদি সারা পৃথিবীতে ইসলামকে শ্বাসরোধ করে ফেলা হয়, কোথাও এক চিলতে জমিন মুসলমানদের জন্য নিরাপদ না থাকে; ঠিক সে সময়ও হিমালয় আর হিন্দুকুশ পর্বতমালার মধ্যে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরিপূর্ণ ইসলাম খুঁজে পাওয়া যাবে। এই অঞ্চলে কিয়ামত পর্যন্ত ইসলাম তার পূর্ণ অবয়বে প্রতিষ্ঠিত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

প্রথম যুগের একজন বিখ্যাত মুসলিম বিজেতা কুতায়বা ইবনু মুসলিম আল বাহিলির দৃষ্টিতে আফগানিস্তান হলো আল্লাহর রাজত্বের মধ্যে থাকা একটি বিশেষ কামান, যেখান থেকে তিনি কাফিরদের দিকে দুর্যোগের সময় গোলা নিক্ষেপ করেন।

বিজয়ীদের রাজপথ, ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য

আফগানিস্তানকে এশিয়ার হৃদয়, মধ্য-এশিয়ার প্রবেশপথ আর বিজয়ীদের রাজপথ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। হাজার বছর ধরে এ অঞ্চলে গোত্রীয় রাজনীতি প্রচলিত রয়েছে। ইসলামপূর্ব সময়ে এখানে জমিদারি আর গোত্রীয় রাজনীতি সব ধরনের বিধিনিষেধ ও নির্দিষ্ট আইনকানুন থেকে স্বাধীন ছিল। সরদার ও নেতৃস্থানীয়রাই নিজেদের বিবেকবুদ্ধি ও ন্যায়পরায়ণতার মাধ্যমে নিজ নিজ অঞ্চল শাসন করতেন। ইসলাম এই অঞ্চলে প্রবেশের পর ইসলামি সংস্কৃতি ও প্রথাসমূহ এখানকার মানুষের অন্তরের গভীরে এমনভাবে প্রোথিত হয় যে, আজ পর্যন্ত একে ন্যূনতম পর্যায়েও প্রভাবিত করা সম্ভব হয়নি।

বিস্তীর্ণ এই ভূমি তুষারাবৃত নয়নাভিরাম পর্বতচূড়া, মনমাতানো নান্দনিক ও নৈসর্গিক সৌন্দর্যে ঘেরা উপত্যকা; কুলু কুলু শব্দে বয়ে চলা বরফগলা নদী আর সবুজশ্যামল চোখজুড়ানো ফল-বাগানের দেশ। এর পূর্বদিকে অবস্থিত সিয়াহ ও সুলায়মান পর্বত আফগান সীমান্তকে পাকিস্তান থেকে পৃথক করেছে। এই পর্বতগুলোর মধ্যেই খাইবার পাস, গোমল পাস, টোচি পাস ও বোলান পাসের মতো বিখ্যাত গিরিপথগুলো অবস্থিত। এই পাসগুলো অতিক্রম করেই বড় বড় বিজেতা উপমহাদেশে আসতেন। কাবুলের উত্তর দিকে অবস্থিত হিন্দুকুশ পর্বতমালা দেশের সর্বোচ্চ পর্বতমালা হিসেবে গণ্য করা হয়, যা উত্তর-পূর্বে পামির মালভূমি থেকে শুরু হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে বিস্তৃত হয়েছে। এই পর্বতমালার কোথাও কোথাও চূড়াগুলো ২০ হাজার ফিট পর্যন্ত উচ্চতা ধারণ করে। পামির মালভূমি এই পর্বতমালাকে চীন থেকে পৃথক করে রেখেছে। মধ্য-আফগানিস্তানের স্থলভাগ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৬ হাজার ফিট উচ্চতায় অবস্থিত।

এই দেশে নদ-নদীর সংখ্যা খুবই কম। যেগুলো বহমান সেগুলোও খুব বড় নয়। কাবুল নদী কাবুলের মধ্যভাগ দিয়ে অতিক্রম করে জালালাবাদ শহরের কাছে কুনার নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে পাকিস্তান সীমান্ত অতিক্রম করে সিন্ধু নদে গিয়ে পতিত হয়েছে। হেলমান্দ ও হারিরুদ নদী হেরাত অঞ্চলের জমিগুলোতে সেচ দিয়ে সিস্তানের (বেলুচিস্তানের) মরুভূমিতে গিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। আমু দরিয়া দেশের উত্তর সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করেছে, যা তাজিকিস্তান ও উজবেকিস্তান থেকে আফগানিস্তানের সীমানাকে পৃথক করে। নদীটি পামিরের সুউচ্চ বরফে ঢাকা মালভূমি থেকে প্রবাহিত হয়ে মধ্য-এশিয়ার ওরাল সাগরে এসে মিশেছে।

দেশটি অতি মূল্যবান খনিজসম্পদে ভরপুর। এ অঞ্চলের মাটি হিরা, মোতি, কয়লা, গ্যাস, তামা, সালফার, ফসফরাস, জিংক, কপার, লোহা, মার্বেল পাথর ও খনিজ লবণের মতো মূল্যবান খনিজসম্পদে পরিপূর্ণ।[১] শীতল আবহাওয়ার এই দেশে পূর্ব ও মধ্যভাগের এলাকাগুলোতে বছরের প্রায় অনেকটা সময় তুষারপাত হয়ে থাকে। কাবুল, গজনি ও বামিয়ানের মতো প্রদেশগুলোতে সারা বছরই শীতল ও কনকনে আবহাওয়া বিরাজ করে। ওদিকে কান্দাহার, সিস্তান, হেলমান্দ, গারমসিরসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশগুলোতে এবং আমু দরিয়া সংলগ্ন উত্তরের এলাকা—যেমন মাজার-ই-শরিফ—এসব অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে অত্যধিক গরম পড়ে থাকে। গরম আবহাওয়ার জন্য জালালাবাদ ও খোস্ত শহর বিখ্যাত।

আফগানিস্তানের জনগণ

পারস্পরিক সমঝোতা ও সহমর্মিতার এই দেশ ৬ লাখ ৪৭ হাজার ৫০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃত। দেশটির জনসংখ্যা প্রায় ২ কোটি ৬০ লাখ। অধিকাংশ মুসলমান সুন্নি। ফিকহের ক্ষেত্রে তারা হানাফি মাজহাবের অনুসারী।

জাতি ও বংশানুক্রমে আফগানিস্তানের মানুষ গোত্র ও উপগোত্রে বিভক্ত। পাখতুন জাতি পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণ-আফগানিস্তানে বসবাস করে। কান্দাহার ও জালালাবাদ এদের বড় শহরগুলোর অন্যতম। তাজিক উপজাতি কাবুল শহর, কাবুলের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলো ও হেরাতে অধিক সংখ্যায় বাস করে। উজবেকদের বড় শহর হলো মাজার-ই-শরিফ। এ ছাড়া হাজারা উপজাতি মধ্য-আফগানিস্তানে বসবাস করে। তবে বর্তমানে একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে এদের গণ্য করা হয়। এদের ওই সকল তাতারের বংশধর মনে করা হয়, যারা চেঙ্গিস খানের সঙ্গে এই অঞ্চলে এসেছিল। এরা ধর্মে শিয়া মতবাদ এবং ভাষায় ফারসি ব্যবহার করে থাকে। ইরান-সীমান্তের লাগোয়া এলাকাগুলোতে বেলুচ জাতির কিছু সদস্যও বসবাস করে। জালালাবাদ শহরের উত্তরে অবস্থিত নুরিস্তান প্রদেশের অধিবাসীরাও রক্ত ও ভাষার দিক থেকে ভিন্ন একটি জাতি হিসেবে পরিচিত। এই জাতির অধিবাসীরা মাত্র ১৫০ বছর আগেও অমুসলিম ছিল। সে সময় এই প্রদেশের নাম ছিল কাফিরিস্তান। আমির আবদুর রাহমানের সময় এখানকার সকল মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। সে সময় থেকে এই অঞ্চলের নাম নুরিস্তান হয়ে পড়ে।

---

[১] সম্প্রতি আফগানের বরকতময় ভূমিতে সময়ের অন্যতম প্রয়োজনীয় খনিজ সম্পদ লিথিয়াম পাওয়া গেছে। এ ছাড়াও রয়েছে প্রচুর পরিমাণ রেয়ার আর্থ মিনারেল। শুধু তা-ই নয়, সারা বিশ্বে মজুদ থাকা লিথিয়ামের একটি বিরাট অংশ আফগান মাটিতে পাওয়া গেছে মর্মে জানানো হয়েছে। বলা হচ্ছে, আফগানিস্তান হবে লিথিয়ামের আরববিশ্ব! ব্যাটারিনির্ভর আগামীর বিশ্বে এই খনিজ হতে যাচ্ছে আরবের তেলসম্পদের প্রধান বিকল্প! আরও জানতে পড়ুন https://reut.rs/3AXkKyG।

ওয়ার্ল্ড ফ্যাক্ট বুক লাইব্রেরি অফ কংগ্রেসের ২০০৪ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, আফগানিস্তানে ৪২% পাখতুন, ২৭% তাজিক, ১০% উজবেক, ৯% হাজারা, ৩% তুর্কমান ও ২% বেলুচ উপজাতি বসবাস করে। এ ছাড়া অল্পকিছু নুরিস্তানি, বারোহি ও পামিরি উপজাতি বসবাস করে। এ দেশে অমুসলিমদের বসবাস নেই বললেই চলে। কাবুল ও অন্যান্য বড় শহরে কিছুসংখ্যক হিন্দু ও শিখ বসবাস করে। এরা বহু শতাব্দী আগ থেকেই এসব এলাকায় বসবাস করে আসছে। এখানকার অধিকাংশ হিন্দু ব্যবসা করে থাকে।

জনগণের পেশা

আফগানিস্তানের গ্রামাঞ্চলগুলোতে লোকেরা খেতখামার ও চাষাবাদ করে জীবনযাপন করে। শাকসবজি, ফলমূলের পাশাপাশি আজকাল আফগানিস্তানে আফিম চাষের ব্যাপক প্রচলন ঘটেছে। দেশটির মাটি অত্যন্ত শুষ্ক প্রকৃতির; নদীমাতৃক ভূখণ্ড এখানে খুবই কম। পাহাড়ি উপত্যকায় বসবাসকারী জনগণ পাহাড়ি নদীগুলোর প্রবাহ থেকে ছোট ছোট নালা কেটে নিজেদের জমিতে নিয়ে আসে এবং এভাবেই সেচকাজ চালায়। বড় বড় ফলের বাগানেও তারা এভাবে সেচের জোগান দিয়ে থাকে।

এ ছাড়া ইরান ও বেলুচিস্তানের কারিজ পদ্ধতি ব্যবহার করেও অনেকে সেচকাজ করে থাকে। কারিজ একটি প্রাচীন সেচপদ্ধতি। এখানে প্রবহমান একটি নদীর কিনার থেকে মাটির নিচ দিয়ে নালা তৈরি করে সেচজমি ও বসতবাড়িতে পানির জোগান দেওয়া হয়। এই নালাগুলো ভূপৃষ্ঠ থেকে ৯ অথবা ১০ ফিট গভীরে তৈরি করা হয়। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এমনভাবে নালাটি ঢালু করা হয়, যেন সেচের জমিতে প্রয়োজন পরিমাণ পানি পৌঁছে গেলে নালাটি এমনিতেই ভূপৃষ্ঠের স্তরে চলে আসে। বন্যা হলে নিম্নমুখী পানির প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। এই নালাগুলোর ওপর ১০০ ফিট পরপর কুয়া খনন করা হয়, যাতে মানুষ তাদের নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় পানির সরবরাহ কুয়ার মাধ্যমে এই নালাগুলো থেকে সংগ্রহ করতে পারে। প্রতি মাইল পর ঝরনার মতো একটি বড় নালামুখও কেটে রাখা হয়, যাতে বড় পরিসরে পানির প্রয়োজন এখান থেকে দ্রুত পূরণ করা যায়।[২]

বেশ কিছু ফল আফগানিস্তানে বিশাল আয়তনের বাগানসমূহে চাষাবাদ করা হয়ে থাকে। যেমন : আঙুর, আড়ু, নাশপাতি, আনার, মালবেরি, আপেল, খরবুজ, তরমুজ ইত্যাদি। শুষ্ক ফলও (ড্রাইফুট) আফগানিস্তানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আখরোট, বাদাম, পেস্তা, কিশমিশ ইত্যাদি। আফগানিস্তানে জাতীয় আয়ের একটি বড় অংশ এসব ফলের রপ্তানি থেকে এসে থাকে। পশুর চামড়ার পশম এবং রেশমি সুতা দিয়ে অসাধারণ কার্পেটশিল্পের প্রচলনও রয়েছে। আফগানিস্তানের তৈরি গালিচা ও কার্পেট

[২] অধিক ধারণা নিতে দেখতে পারেন www.youtube.com/watch?v=zockOFKK2XE

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়। গরু-ছাগলের জবাইকৃত চামড়াও প্রক্রিয়াজাত করে বিশ্বব্যাপী রপ্তানি করা আফগানদের অনেক পুরানো একটি আয়ের উৎস। কারাকলিও প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করা হয়। বুজকাশি জবাই করা বকরিকে ছিনিয়ে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করা আফগানিস্তানের প্রাচীন একটি খেলা।[৩] এ খেলাটি অত্যন্ত হৃদয়বিদারক এবং পশুদের জন্য কষ্টকর হওয়ায় তালেবান সরকার একে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল।

আফগানদের আচার-ব্যবহার

আমির হাবিবুল্লাহ খানের সময় তার সেনাবাহিনীতে জাফর হাসান আইবেক নামের একজন বিশিষ্ট সেনা অফিসার ছিলেন। তিনি তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আফগানদের চালচলন ও আচার-ব্যবহারের ব্যাপারে লেখেন, আফগান জনগণ অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী। তারা অসমসাহসী ও অসাধারণ যোদ্ধা। ঘোড়ায় চড়ে দৌড়ানো অথবা যুদ্ধে যাওয়া তাদের প্রিয় শখ; কিন্তু মাদি ঘোড়ায় চড়া পুরুষদের জন্য বেমানান মনে করা হয়। যুদ্ধে হামলার সময় আফগানরা অসীম সাহস দেখিয়ে থাকে। অত্যন্ত ধৈর্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে তারা নিজেদের অবস্থানকে সংরক্ষণ করে। কিন্তু যদি যুদ্ধে পরাজয় এসে যায়, তাহলে দ্রুত হীনম্মন্য হয়ে পড়ে। এখানকার লোকেরা খুবই স্বাধীনচেতা এবং নিজেদের আফগানি জাতিসত্তার ওপর গর্ব করে থাকে।

তিনি আরও লেখেন, এসব জাতির মধ্যে যেসব উপজাতি পূর্ব দিকের পাহাড়ি এলাকায় বসবাস করে, তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ আর যুদ্ধ কখনো শেষ হয় না। একই গোত্রের বিবাদ দীর্ঘদিন চলমান থাকে এবং একটি হত্যার বদলা নিতে বছরের পর বছর অন্যরা প্রতিপক্ষের ওপর সুযোগ খুঁজতে থাকে। এ জন্য তাদের পারস্পরিক লড়াই-ঝগড়া কখনো শেষ হয় না। অনেকটা আরবের জাহিলি সমাজের মতো। কিন্তু তাদের মধ্যে মেহমানদারির একটি নববি গুণ রয়েছে। সন্ধ্যায় যদি কোনো মুসাফির কারও বাসায় আসে, তাহলে তার জন্য সবধরনের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে থাকে তারা। এমনকি এ সময় যদি কোনো চরম শত্রুও নিরাপত্তা খুঁজতে তাদের কাছে সহযোগিতা চায়, তখন তারা প্রতিশোধের পরিবর্তে তাকে নিজেদের ঘরে আশ্রয় দেয়। আফগানরা এই গোত্রীয় রীতি বহুকাল ধরে পালন করে আসছে। তারা একে পাখতুন ওয়ালি[৪] রীতি নামে ডাকে। এ রীতিকে ছোট-বড়, পুরুষ-মহিলা সকল সদস্যই মেনে চলে। যদিও এ রীতিটি লিখিতভাবে আইনের কোনো ব্যাখ্যাগ্রন্থ বা অধুনা আফগান সংবিধানে উপস্থিত নেই।[৫]

---

[৩] মূলত মধ্য-এশিয়ার প্রাচীন খেলা এটি। ধারণা নিতে দেখতে পারেন www.youtube.com/watch?v=ta3izb3CPuc

[৪] এই রীতি পশতুন ওয়ালি নামেও সমধিক পরিচিত।

[৫] *আপবিতি* : ১/৫৩, ৫৪।

আফগানদের বংশধারা

আফগানজাতির পূর্বপুরুষ কারা? 'আফগান' শব্দটির ব্যবহার কবে থেকে শুরু হয়েছে? কোন জাতির সঙ্গে তাদের রক্তধারা মিলিত হয়েছে? এসব প্রশ্নের বেশ কয়েকটি জবাব রয়েছে; কিন্তু কোনো জবাবই একদম সুনিশ্চিতভাবে সঠিক বলে দাবি করা সম্ভব নয়। আফগানদের মধ্যে একটি বর্ণনা প্রচলিত রয়েছে যে, তাদের আদি পুরুষ ছিলেন কায়েস নামের একজন গুণধর ব্যক্তি। তাঁর ছিল তিন ছেলে—সারবা নাড়ে, বাতান ও গাউর গাশত। প্রথমজনের অধস্তন সন্তানাদি থেকে সাদ্দুজাই, আচাকজাই, বারেকজাই ও শিনওয়ারি গোত্র জন্মলাভ করে। বাতানের সন্তানদের মাধ্যমে গুলজাই, লোদি ও সুরি গোত্র জন্ম নেয়। গাউর গাশতের সন্তানদের মাধ্যমে মান্দখেল, কাকাড়, সাফি ও মুসিখেল ইত্যাদি অস্তিত্ব লাভ করেছে। এটাও বলা হয়ে থাকে যে, বুরহান নামে কায়েসপুত্র গাউর গাশতের এক সন্তান ছিল। কারলা নারে নামের একব্যক্তি তার বংশে জন্ম নেয়। আফ্রিদি, মেহসুদ, খটক, ওয়াজির, ওরাকজাই ইত্যাদি সীমান্তবর্তী এলাকার গোত্রগুলো তারই বংশে জন্মলাভ করে।

আফগানদের বংশধারা নিয়ে আরেকটি বিখ্যাত মত রয়েছে—আর্যরা যখন মধ্য-এশিয়া থেকে পূর্ব দিকে নতুন উর্বর ভূমির সন্ধানে এগিয়ে আসছিল, তখন হিন্দুস্থানে প্রবেশের আগে তারা কিছুদিন আফগানিস্তানে অবস্থান করে। কিন্তু আফগানিস্তানের বৈরী আবহাওয়া ও পরিবেশ তাদের অনুকূল মনে না হওয়ায় অবশেষে তারা হিন্দুস্থানে প্রবেশ করে। তবে এদের মধ্যে কিছুসংখ্যক আর্য আফগানিস্তানেই থেকে যায়। আলোচ্য মতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আফগানজাতির উদ্ভব এদের মাধ্যমেই হয়েছে।

আফগানদের তিনটি অনন্য বৈশিষ্ট্য

আফগানিস্তানের ইতিহাস এবং আফগানদের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে তাদের মধ্যে মৌলিক ও অনন্য তিনটি বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায় : দৃঢ় ইমান, স্বাধীনচেতা মনোভাব ও জিহাদি[৬] চেতনা।

আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস এবং শুধু তাঁরই প্রতি আকণ্ঠ ভরসা আফগানজাতির অস্থিমজ্জায় মিশে আছে। স্বাধীন জীবন এবং নিজ মাতৃভূমির স্বাধীনতা তাদের অস্তিত্বের অংশ। এ দুটি বৈশিষ্ট্য প্রত্যেক যুগে আফগানিস্তানের ওপর হামলে পড়া অবৈধ ও অত্যাচারী বহিরাগত শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে তাদের অনুপ্রাণিত করেছে। আফগানিস্তানের ইসলামি ইতিহাস অধ্যয়ন করলে এ চিত্র বার বার সামনে আসে। শত শত বছর ধরে এখানে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে স্মরণীয় যুদ্ধাবস্থা চলে

[৬] অথবা আরেক অর্থে স্বাধিকার চেতনাও বলা যেতে পারে।

আসছে। সব যুগের জালিম ও বাতিল শক্তি আফগানিস্তানের মাটিতে এসেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে। আফগানিস্তানের ইতিহাসের প্রত্যেকটি যুগকে পৃথকভাবে আলোচনার আগে আমরা সংক্ষেপে এই অঞ্চলের বিগত কয়েক হাজার বছরের ইতিহাস সামান্য কয়েকটি পৃষ্ঠায় আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। এর মাধ্যমে পরবর্তী অধ্যায়গুলো পাঠ করে আপনারা পরিস্থিতির সঠিক উপলব্ধি করতে পারবেন।

একনজরে ইসলামপূর্ব যুগে আফগানিস্তান

আফগানিস্তানের ইতিহাস কয়েক হাজার বছরের ইতিহাস। পুরাতত্ত্ববিদদের মতে, আফগানিস্তানে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক আলামত দেখে মনে হয়, এখানে ৪-৮ হাজার বছর আগের মানবসভ্যতার নিদর্শন রয়েছে। কান্দাহারে পাওয়া আলামত থেকে প্রমাণিত হয়েছে, ইসা আ.-এর আগমনের ৩ হাজার বছর আগে এ অঞ্চলের মানুষ কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত। বামিয়ান প্রদেশের কাছে 'চেহেল সুতুন' এবং মাজার-ই-শরিফের কাছে 'আক কাপরুক' নামে দুটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন প্রমাণ করে, এখানেও কয়েক হাজার বছর আগের মানবসভ্যতার আলামত রয়েছে। হিন্দুকুশ পর্বতমালার প্রাচীন বাণিজ্যিক পথগুলো থেকে প্রাপ্ত আলামত দেখে মনে হয়, আফগানিস্তানের সঙ্গে প্রাচীন মেসোপটেমিয়া[৭] বা ইরাকের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এই পথ ইরাক ছাড়াও অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কের কাজেও ব্যবহৃত হতো বলে অনুমান করা হয়।

এসব তথ্যপ্রমাণ আমাদের বিশ্বাস করতে বাধ্য করে যে, প্রাচীন কাল থেকেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যরুট হিসেবে আফগানিস্তানের পাহাড়ি গিরিপথগুলো ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এখানে হড়প্পা সভ্যতার কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়, যা খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় ২ থেকে ৩ হাজার বছর পুরানো। এর থেকে খ্রিষ্টপূর্ব আরও দেড় থেকে ২ হাজার বছর পুরানো কিছু নিদর্শনও পাওয়া যায়, যা মধ্য-এশিয়ার দিক থেকে আর্যদের আগমনের ব্যাপারে স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়। আর্যরা আফগানিস্তানে এসে বহু বছর স্থায়ীভাবে বসবাস করেছিল। পরে তারা হিন্দুস্থানের দিকে চলে যায়। এ সময় আফগানিস্তানকে ডাকা হতো 'আরিয়ানা' নামে।

সে সময় আফগানিস্তান অনেক গোত্র ও উপগোত্রে বিভক্ত ছিল। এ ছাড়া কিছু রাজনৈতিক মতপার্থক্য আফগানদের অভ্যন্তরীণভাবে সবসময় দুর্বল করে রাখত।

[৭] মানবসভ্যতার প্রাচীন ক্রোড় এই মেসোপটেমিয়া। এর অর্থ নদীর মধ্যে থাকা বিস্তীর্ণ অঞ্চল। দজলা-ফোরাত (টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস) নদীর অববাহিকায় গড়ে উঠেছিল এই সভ্যতা। মধ্যপ্রাচ্যের প্রাণভোমরা এই দুই নদী। তুরস্ক-আরমেনিয়ার উচ্চ পর্বতশ্রেণি থেকে প্রবাহিত হয়ে কুয়েতের শাতিল আরবে দুটি নদী একত্রে মিশে গিয়েছে। মাঝে তৈরি করেছে প্রায় ৪ লাখ বর্গ কিলোমিটারের উর্বর ভূমি। এটিই আমাদের প্রাচীন মেসোপটেমিয়া।

কিন্তু বহিঃশত্রুর আক্রমণের সময় যুদ্ধবাজ এই আফগান উপজাতিগুলোই একযোগে শত্রুর মোকাবিলায় নেমে পড়ত। এ কারণে আরব উপদ্বীপের মতো আফগানিস্তানেও শক্তিশালী কোনো রাজা-বাদশাহ অথবা বিজেতা সহজে আক্রমণের কথা ভাবতে পারত না। আফগানদের এই অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে সাম্রাজ্যবাদী আর্যরা বেশি দিন আফগানিস্তানে অবস্থান না করে তুলনামূলক দুর্বল ও অপেক্ষাকৃত উর্বর ভূমি হিন্দুস্থানের দিকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

আর্যরা যখন গঙ্গা-যমুনার উর্বর বদ্বীপের দিকে এগিয়ে আসে, তখন এ অঞ্চলগুলোতে ধীরে ধীরে অগ্নিপূজকদের আনাগোনা বেড়ে যায়। খ্রিষ্টপূর্ব ছয় শতকে উপমহাদেশে অগ্নিপূজা মূল ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। অগ্নিপূজকদের বিখ্যাত দেবতা জরাথুস্ত্র[৮] এই আফগান অঞ্চলেই জন্মগ্রহণ করে। জরাথুস্ত্রের অনুসারীদের যষ্টি নামে ডাকা হতো। সংখ্যায় এরা তখনকার হিসাবে অনেক ছিল।

ইসা আ.-এর আগমনের প্রায় ৬০০ বছর আগে ইরানের বাদশাহ খসরু—যাকে

---

[৮] জরাথুস্ত্রবাদ বা জরাথুস্ট্রবাদ (ইংরেজি : Zoroastrianism বা Zarathustraism) বা পারসিক ধর্ম (Magianism) একটি অতিপ্রাচীন ইরানীয় একেশ্বরবাদী ধর্ম বা ধর্মীয় মতবাদ। ভারতীয় উপমহাদেশে এটি পারসিক ধর্ম নামেও পরিচিত। জরাথুস্ত্রীয় বা পারসিক ধর্মের প্রবর্তক জরথুস্ত্র। তার নামানুসারেই বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় এই ধর্মের নাম হয়েছে 'জরোয়াস্ট্রিয়ানিজ্‌ম' বা জরাথুস্ট্রবাদ। এ ধর্মে ঈশ্বরকে অহুর মজদা বা আহুরা মাজদা (সর্বজ্ঞানস্বামী) নামে ডাকা হয়। এদের ধর্মগ্রন্থের নাম অবেস্তা (বা আবেস্তা) বা জেন্দাবেস্তা। পারসিক ধর্মের অনুসারীরা অগ্নি-উপাসক। আগুনের পবিত্রতাকে ঈশ্বরের পবিত্রতার সঙ্গে তুলনীয় মনে করে পারসিক জরথুস্ত্রীয়রা। আরবিতে এরা মাজুস (যার একবচন মাজুসি) নামে পরিচিত।

এককালের হাখমানেশি, পার্থীয় ও সাসানীয় সাম্রাজ্যগুলোর রাষ্ট্রধর্ম ছিল জরথুস্ত্রবাদ। পারসিকদের প্রধানত 'অগ্নি-উপাসক' নামে সংজ্ঞায়িত করা হলেও জরথুস্ত্রীয়দের অগ্নি উপাসনার ধারণাটি মূলত জরথুস্ত্রবাদ-বিরোধী বিতর্ক থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। প্রকৃতপক্ষে আগুনকে পারসিক ধর্মে শুদ্ধতার প্রতিনিধি এবং ন্যায় ও সত্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়; এমনকি তাদের অগ্নি-মন্দিরেও (পারসিক পরিভাষায় সরল অর্থে আগুনের ঘর) এই একই ধারণা পোষণ করা হয়। বর্তমানের বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে যে, অগ্নি প্রজ্বালনের কারণ হলো, তা সর্বদা যেকোনো ঊর্ধ্বমুখী বস্তুবিশেষকে পুড়িয়ে ফেলে এবং তা কখনোই দূষিত হয় না। তা সত্ত্বেও 'সাদে' ও 'চাহারশনবা-এ-সুরি' হলো বৃহত্তর ইরানের সর্বত্র উদ্‌যাপিত দুটি অগ্নি-সম্পর্কিত উৎসব এবং এ দুটি উৎসবে সেই যুগের রীতিতে ফিরে যাওয়া হয়, যে যুগে জরথুস্ত্রীয় ধর্ম ইরানে সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী ধর্ম ছিল।

জরথুস্ত্রবাদে আপস বা আবান অর্থাৎ, পানি ও আতর বা আদুর অর্থাৎ, আগুন হলো ধর্মীয় পবিত্রতার প্রতিনিধি এবং এ সম্পর্কিত শুদ্ধীকরণ আচার-অনুষ্ঠানসমূহকে ধর্মীয় জীবনব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জরথুস্ত্রীয় সৃষ্টিতত্ত্ব অনুসারে পানি ও আগুন হলো যথাক্রমে দ্বিতীয় ও শেষ সৃষ্ট প্রভাবশালী পদার্থ। আর তাদের ধর্মীয় গ্রন্থে পানিকে সৃষ্টিগতভাবে আগুনের উৎস মনে করা হয়েছে। আগুন ও পানিকে জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য বলে মনে করা হয়; আর আগুন ও পানি উভয়কেই অগ্নি-মন্দিরের চারপাশে প্রতীকীরূপে তুলে ধরা হয়। জরথুস্ত্রীয়রা বিভিন্নভাবে প্রজ্বলিত আগুনের (যাকে যেকোনো ধরনের আলোতে স্পষ্টভাবে দেখা যায়) উপস্থিতিতে উপাসনা করে থাকে এবং উপাসনার মৌলিক কাজের চূড়ান্ত আচারটি 'জলরাশির শক্তি'রূপে সংযুক্ত হয়। আগুনকে একটি মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি অর্জিত হয়। আর পানিকে সেই জ্ঞানের উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। —*সম্পাদক*।

সাইরাসে আজমও বলা হয়—আফগানিস্তান কিছুসময়ের জন্য দখল করেছিল; কিন্তু স্বাধীনচেতা আফগানরা ইরানের অধীনতা মেনে নিতে পারেনি। ফলে দীর্ঘকাল ইরানের সঙ্গে আফগানের যুদ্ধ চলতে থাকে। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩১ অব্দে এখানে ইরানি বাদশাহ দারার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

আলেকজান্ডারের আফগানিস্তান আক্রমণ

খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩০ অব্দে গ্রিসের বিশ্বখ্যাত বিজেতা আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট ইউরোপের দেশগুলো বিজয়ের পর এশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলের প্রতি মনোনিবেশ করেন। একের পর এক দেশ বিজয়ের পর তিনি এসে পৌঁছান আফগানিস্তানে। ইরানি বাদশাহ দারার সেনাবাহিনী আলেকজান্ডারের সামনে টিকতে না পেরে পরাজয় বরণ করে; কিন্তু চির অদম্য আফগানজাতি বীরের মতো অসম সাহসিকতার সঙ্গে আলেকজান্ডারের বিশ্বজয়ী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যায়।

সেই যুগে আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চল আরিয়ানা ও আরকুসিয়া নামে পরিচিত ছিল। উত্তরাঞ্চলকে বাহতারিয়া বলা হতো। এসব যুদ্ধবাজ গোত্র নিজেদের পারস্পরিক বিবাদ মিটিয়ে আলেকজান্ডারের বিরুদ্ধে অটল প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে যায়। আলেকজান্ডারের রক্তপিপাসু সেনাবাহিনীকে তারা দীর্ঘ চার বছর যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যস্ত রাখে। দু-পক্ষেই প্রচুর প্রাণহানি হয়। আলেকজান্ডার নিজেই পূর্ব-আফগানিস্তানে একটি যুদ্ধে মারাত্মক আহত হন। দীর্ঘদিন নিজ দেশের আবহাওয়া থেকে দূরে থাকায় এবং একের পর এক যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় আলেকজান্ডারের সেনাবাহিনীও একপর্যায়ে মনোবল হারিয়ে ফেলে। এরপরও খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে আলেকজান্ডার আফগানিস্তানের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। আফগানদের পরাজয়ের অন্যতম কারণ ছিল কেন্দ্রীয় কোনো নেতৃত্ব না থাকা।

দীর্ঘ চার বছর যুদ্ধ করার ফলে গ্রিসের সেনাবাহিনীরও অপূরণীয় ক্ষতি হয়। তাদের বহু যোদ্ধার মৃত্যু হয় এবং প্রচুর পরিমাণ যোদ্ধা আহত হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করে। এসব খবর ইউরোপে পৌঁছলে ইউরোপবাসীর মনে আফগানজাতির বীরত্ব, সাহসিকতা ও অদম্য মনোবলের ব্যাপারে একটি মানবীয় শ্রদ্ধা ও ভীতি তৈরি হয়, যা আজও তাদের মধ্যে কাজ করে। আলেকজান্ডার নিজে আফগানদের বীরত্ব ও সাহসিকতায় মুগ্ধ হন। তার বিশ্বজয়ী বাহিনীকে পৃথিবীর বহু শক্তিধর দেশ সামান্য দিনের জন্যও আটকে রাখতে পারেনি; কিন্তু আফগানরা দীর্ঘ চার চারটি বছর তাদের স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে দেয়নি।

উপমহাদেশের প্রতিরক্ষাব্যূহ

এ ঘটনা থেকে এটি প্রমাণিত হয়, বহিঃশক্তির আক্রমণ থেকে উপমহাদেশকে রক্ষার

ক্ষেত্রে আফগানিস্তান ঐতিহাসিকভাবে সবসময় একটি প্রতিরক্ষাব্যূহ ও ফ্রন্টলাইন হিসেবে কাজ করেছে। আলেকজান্ডারের পর মোঙ্গল আক্রমণ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের দখলদারত্বের সময় এ বাস্তবতা আরও দুবার প্রমাণিত হয়; আর চলমান সময়ে তো আমেরিকাসহ ৪৮টি দেশের সম্মিলিত ন্যাটোবাহিনীর বিরুদ্ধে তালেবানরা ইতিহাসের সবচেয়ে অসম প্রতিরক্ষাযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। মানবেতিহাসের অন্যতম বড় অলৌকিক ঘটনায় রূপ নিয়েছে এই যুদ্ধ।[৯]

আলেকজান্ডারের আফগানিস্তান আক্রমণের সময় উপমহাদেশের পাঞ্জাব অঞ্চলে রাজা পোরাসের শাসন ছিল। এই রাজা একটি ঐতিহাসিক ভুল করেছিলেন। তিনি আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্যবাদী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আফগানজাতিকে কোনো সহায়তা করেননি; বরং দীর্ঘ চার বছর ধরে চলা যুদ্ধ তিনি হেসেখেলে দর্শক হিসেবে শুধু পর্যবেক্ষণ করেন। গুণধর ও শক্তিশালী প্রতিবেশীকে প্রয়োজনের সময় সহযোগিতা না করার পরিণতি তাকে খুব দ্রুতই ভোগ করতে হয়। আফগানদের পতনে উপমহাদেশের প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেঙে যায় এবং আলেকজান্ডার প্রথমেই পাঞ্জাব আক্রমণ করে পাঞ্জাবকে তছনছ করে দেন। এ ছাড়া আশপাশের রাজ্যসহ পুরো উপমহাদেশকে তিনি নিজ হিংস্রবাহিনীর হাতে ছেড়ে দেন।

ঝিলাম নদীর পাড়ে প্রচণ্ড এক যুদ্ধে পাঞ্জাবের রাজা পোরাস শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। বিজয়ী শক্তি হিসেবে পুরো উপমহাদেশে গ্রিকসভ্যতা তখন প্রচার-প্রসার লাভ করে। খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৩ অব্দে দেশে ফেরার পথে আলেকজান্ডার ইরাকে মৃত্যুবরণ করেন। এরপর এ অঞ্চলে গ্রিকদের প্রভাব কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। এ সময়ে হিন্দুস্থানে একটি বড় পরিবর্তন আসে। নান্দা রাজবংশের দুর্বল শাসন সরিয়ে শক্তিশালী মৌর্য সাম্রাজ্যের সূচনা ঘটে। মৌর্যরা ক্ষমতায় আসতেই আলেকজান্ডারের সেনাবাহিনীর সঙ্গে তাদের অনিবার্য সংঘাত শুরু হয়। তখন পাঞ্জাব থেকে ইরাক পর্যন্ত আলেকজান্দ্রীয় সাম্রাজ্যের সেনাপতি ছিলেন জেনারেল সেল্যুকাস (Seleucus)। আলেকজান্ডারের পর তার অধীনে থাকা অঞ্চলকে সেল্যুসিড সাম্রাজ্য (Seleucid) বলা হতো। এই সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল তখনকার ইরাকের প্রাচীন শহর ব্যাবিলন।

খ্রিষ্টপূর্ব ৩০৬ অব্দে মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সেল্যুকাসের মোকাবিলার জন্য ৫০০ হাতির বিশাল বহর নিয়ে একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করেন। দুর্বল হয়ে পড়া সেল্যুকাস চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শক্তিশালী আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে

---

[৯] আল্লাহর অশেষ রহমতে বীর আফগানজাতি সম্মিলিত পশ্চিমা বাহিনীকে নাকানিচুবানি খাইয়ে সামরিক ও কূটনৈতিক উভয় ক্ষেত্রে পরাজিত করেছে। বিগত ১৫ সেপ্টেম্বর সামরিক শক্তিবলে তালেবান মুজাহিদরা কাবুলসহ সমগ্র আফগান ভূমি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ!

সিন্ধু নদের পশ্চিম পাড়ে পালিয়ে যান। এভাবে উপমহাদেশের মূল ভূখণ্ড থেকে বহিরাগত আর্যদের সাম্রাজ্যবাদী যুগের সমাপ্তি ঘটে। সেল্যুকাস সিন্ধু নদের পশ্চিমে গিয়ে আফগানিস্তান থেকে ইরাক পর্যন্ত অঞ্চলে শাসন চালিয়ে যান।

বৌদ্ধধর্মের গোড়াপত্তন ও প্রচার

২৬১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে হঠাৎ করে উপমহাদেশের সার্বিক চিত্রে আরেকটি পরিবর্তন ঘটে। মৌর্য সাম্রাজ্যের বিখ্যাত শাসক সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি তার সাম্রাজ্য শুধু উপমহাদেশ নয়; বরং পূর্ব ও মধ্য-আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। তার শাসনামলে আফগানিস্তানের রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তন ঘটে। সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন।

বৌদ্ধ শাসকরা আফগানিস্তানের ভূখণ্ড ধীরে ধীরে পুরোটাই তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন; কিন্তু আফগানিস্তানে উপস্থিত গ্রিকদের সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করতে পারেননি। খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০ অব্দে গ্রিকরা পুনরায় আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলে 'বাখতার' নামে নতুন একটি রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করে। নতুন এ রাষ্ট্রটি বহু বছর এই নামে টিকে থাকে। এই সময়ে পারথি (Parthian Empire) জাতিগুলো শাসনক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে গ্রিকদের সঙ্গো সমানতালে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে আফগানিস্তানের অনেক এলাকায় পারথিদের মজবুত শাসন ছিল।

খ্রিষ্টপূর্ব ১৩৫ অব্দে পূর্ব-তুর্কিস্তান থেকে ইউয়েঝি (Yuezhi) গোত্র নতুন প্রেক্ষাপট তৈরি করে। তারা দক্ষিণে বিজয়াভিযান অব্যাহত রেখে সিংকিয়াং থেকে পেশোয়ার, সোয়াত এমনকি পাঞ্জাব পর্যন্ত তাদের রাজত্বের বিস্তৃতি ঘটায়। খ্রিষ্টপূর্ব ১২৮ অব্দে তারা গ্রিকদের বাখতারিয়া প্রদেশে হামলা চালিয়ে তাদের পরাজিত করে সমগ্র উত্তর-আফগানিস্তানে ইউয়েঝিদের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ইউয়েঝিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরে আরেকটি চীনা গোত্র চিউনি (Chionites) আফগানিস্তান আক্রমণ করে। এই গোত্রও দীর্ঘ সময় আফগানকে তাদের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখে। ৪০ খ্রিষ্টাব্দে ইউয়েঝি গোত্রের একজন সরদার কুজুলা কাদফিসিস (Kujula Kadphises) প্রথম পেশোয়ারে কুশান রাজবংশের নামে একটি নতুন রাষ্ট্রের সূচনা করেন, যা পরে গান্ধারা রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ৮৫ খ্রিষ্টাব্দে তাদের বংশধররা এই রাষ্ট্রকে বেনারস পর্যন্ত বিস্তৃত করে। তারা সিন্ধু, রাজপুতানা ও কাঁথিওয়াড় থেকে পারথিদের রাজত্ব মিটিয়ে দেয়।

১২৫ থেকে ১৫২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানে কুশান রাজবংশের (Kushan Dynasty) বিখ্যাত রাজা কনিস্ক দ্য গ্রেটের (Kanishka the Great) শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি পেশোয়ার ও কাবুলের মধ্যখানে তার রাজধানী স্থাপন করেন। তিনিও সম্রাট

অশোকের মতো বৌদ্ধধর্মের একনিষ্ঠ প্রচারক ছিলেন। ফলে বৌদ্ধধর্ম আরেকবার দক্ষিণ-এশিয়া ও আফগানিস্তানে রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা লাভ করে এবং জনগণ গান্ধারা সভ্যতার আচার-রীতি পালনে বাধ্য হয়।

চীনা এই শাসনকর্তা স্থানীয় হিন্দুদের দেখাদেখি গৌতমবুদ্ধের মূর্তি তৈরির আদেশ দেন এবং একপর্যায়ে সমগ্র গান্ধারা সাম্রাজ্যে বুদ্ধের হাজার হাজার মূর্তি ও প্রতিকৃতি ছড়িয়ে পড়ে। তিনিই বামিয়ান প্রদেশে গৌতমবুদ্ধের ১২০ বাই ১৭৫ ফিট উঁচু বিশাল মূর্তি নির্মাণ করেন। বৌদ্ধধর্মের অনুসারীদের কাছে সবচেয়ে বড় বুদ্ধমূর্তি হিসেবে এটি বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধার জায়গা দখল করে ছিল। সে যুগে সিল্করোড বিশ্ববাণিজ্যের সবচেয়ে ব্যস্ততম বাণিজ্যিক পথ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চল দিয়ে এই বিশ্বরোডের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ চলে গেছে। চীন, ইউরোপ ও দক্ষিণ-এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আফগানিস্তানের সিল্করোডের এ অংশ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হতো। ফলে আফগানিস্তান বিশ্ববাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাব বা জংশন হিসেবে পরিচিত ছিল।

রাজা কনিস্কের মৃত্যুর পর গান্ধারা সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। ২৪১ খ্রিষ্টাব্দে ইরানের সাসানি বংশ কুশান বংশের এই সাম্রাজ্য থেকে বেশ কিছু প্রদেশ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। এরপর মধ্য-এশিয়া থেকে সাদা হান[১০] যাযাবর জাতি আফগানিস্তান আক্রমণ করে এবং কাবুল ও গজনি দখল করে গান্ধারা সাম্রাজ্যে শেষ পেরেক ঠুকে দেয়। তারা আরও আগে এগিয়ে হিন্দুস্থানের পশ্চিমাঞ্চল এবং ইরানের পারথিদেরও ক্ষমতা থেকে বেদখল করে দেয়। ৩৭০ থেকে ৫৩০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ে আফগানিস্তান ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এই রাজবংশের শাসন ছিল।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইরানের বিখ্যাত ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ নওশেরওয়া পুনরায় এসব অঞ্চল নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন; কিন্তু বেশিদিন ক্ষমতা ধরে রাখতে পারেননি। চীনাদের সঙ্গে অনেক যুদ্ধের পর অবশেষে চীনারা তাঁকে ইরানের উত্তরাঞ্চলে ছোট্ট একটি এলাকায় ক্ষুদ্র পরিসরে শাসনকাজ পরিচালনায় বাধ্য করে।

অন্ধকার যুগে আফগানিস্তান

সময়ের কাঁটায় দেখতে দেখতে সপ্তম শতাব্দী এসে পড়ে। আফগান জনগণ এ সময়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের বিভক্তি ও পারস্পরিক বিবাদে লিপ্ত ছিল। বীরত্ব ও সাহস তাদের রক্তে-

[১০] মধ্য-এশিয়ার যাযাবর জাতি। সামরিক শক্তি অর্জন করে এরা আফগান, ইরান ও পশ্চিম-হিন্দুস্থান দখল করেছিল। বেশ কয়েক শতাব্দী তারা শক্তিবলে এসব অঞ্চলে শাসন বজায় রাখে। আরও জানতে দেখুন https://en.wikipedia.org/wiki/Hephthalites।

মাংসে মিশে থাকলেও কেন্দ্রীয় কোনো নেতৃত্বের অধীনে আসতে না পারায় একের পর এক বহিঃশাসনের মধ্য দিয়ে তাদের যেতে হয়। ভাষা ও গোত্রীয় বিবাদের পাশাপাশি চিন্তাধারা ও ধর্মীয় মতপার্থক্য তাদের সমাজকে পতনের চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে আসে। পশ্চিম-আফগানিস্তানের ফারাহ, নিমরোজ ও হেরাত প্রদেশ সে সময় ইরানের সাসানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এসব অঞ্চলের জনগণকে নিজেদের পূজনীয় ব্যক্তি হিসেবে জরাথুস্ত্রকে গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। এভাবে ধীরে ধীরে এই প্রদেশগুলোর জনগণ বৌদ্ধধর্মের অনুসারী থেকে পুনরায় অগ্নিপূজকে পরিণত হয়।

মধ্য ও পূর্ব-আফগানিস্তানে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। কাবুল থেকে কান্দাহার পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের চর্চা হতো। রাস্তার মোড়ে মোড়ে, মানুষের ঘরে ঘরে গৌতমবুদ্ধের ছোট-বড় হাজার হাজার মূর্তি দেখা যেত। বেশ কয়েকটি চীনা রাজবংশ আফগানিস্তান শাসনের ফলে চীনা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য কিছু কিছু অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করে। ইতিহাসের এই নাজুক মুহূর্তে আফগানজাতি তাদের স্বকীয়তা প্রায়ই হারাতে বসে। আর এই সুযোগে পৃথিবীর শক্তিধর রাজবংশ ও শাসকরা যেন পোলো খেলার দণ্ড হাতে আফগানিস্তানের ভূখণ্ড নিয়ে নিজেদের ইচ্ছামতো খেলে যাচ্ছিল।

তথ্যসূত্র

১. *আল-কামিল ফিত তারিখ*, ইবনুল আসির আল জাজারি।

২. *আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার*, আবুল ফিদা (প্রথম খণ্ড)

৩. *Encyclopedia of Islam*. Vol-1

৪. *উর্দু দায়িরায়ে মাআরিফে ইসলামিয়া*, দানিশগাহ, পাঞ্জাব।

৫. *ইসলামি এনসাইক্লোপিডিয়া*, সাইয়িদ কাসিম মাহমুদ।

৬. *উর্দু ডাইজেস্ট*, জুন ২০০৩।

৭. *দারিয়ায়ে কাবুল সে দারিয়ায়ে ইয়ারমুক তাক*, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদবি।

৮. *সাইরে আফগানিস্তান*, আল্লামা সাইয়িদ সুলায়মান নদবি।

৯. *কাদিম তারিখে হিন্দ*, প্রফেসর জামিলুর রাহমান।

১০. *আপবিতি*, জাফর হাসান আইবেক।